HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা
বর্ষ ৯ • সংখ্যা ৩ • সেপ্টেম্বর ২০১১
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৮
বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ১৫
২০১১ সালে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় কলেরার প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ২২
সার্ভিলেন্স আপডেট

বাংলাদেশে তৃতীয় স্তরের (উচ্চমানের) জৈব-সতর্কতামূলক (বায়োসেফটি) গবেষণাগারের ভূমিকা

এইচআইভি, *ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস*, রোগ সৃষ্টিতে পারদর্শী উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এবং বহু ওষুধপ্রতিরোধী *মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস* বা যক্ষ্মা রোগের জীবাণুসহ বাংলাদেশে বিরাজমান কতিপয় সংক্রামক রোগের জীবাণু একটি তথাকথিত পুরনো গবেষণাগারে নিম্নমানের জৈব-সতর্কতা (বায়োসেফটি) অবলম্বন করে নিরাপদে গবেষণা করা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের লক্ষে নিরাপদে এসব সংক্রামক রোগের জীবাণুর কালচার করার জন্য বাংলাদেশে তিন স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক বা বায়োসেফটি লেভেল৩ (বিএসএল৩) একটি গবেষণাগার নির্মাণ এবং অত্যাধুনিক গবেষণাগার হিসেবে এর সনদপ্রাপ্তির কথা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

যেকোনো রোগ প্রতিরোধ করা, তার বিস্তার ঠেকানো, তার ওপর নজরদারি এবং তার চিকিৎসার মূল ভিত্তি হচ্ছে গবেষণাগারে সতর্কতার সাথে রোগ নির্ণয় করা। রোগ সৃষ্টিকারী অভিনব জীবাণু, বহু ওষুধপ্রতিরোধী ব্যাক্টেরিয়া এবং রোগ সৃষ্টিতে পারদর্শী উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাসসহ রোগ সৃষ্টিকারী কতিপয় সংক্রামক জীবাণু বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। তবে নিম্নস্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে সাবধানতার সাথে এগুলোর ওপর গবেষণা করা যায় না। এসব রোগের হুমকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে দেশের মধ্যে এমন গবেষণাগার প্রয়োজন, যেখানে নিরাপদে রোগ নির্ণয়, সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু পৃথককরণ এবং সেগুলোর ধরন নির্ণয় করা যায়।

মানুষ ও পশুর মধ্যে অণুজীবসমূহ (মাইক্রোঅর্গানিজমস)-এর রোগ

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

সৃষ্টির ক্ষমতা ও ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সেগুলোকে চারটি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীতে (আরজি) বিভক্ত করা হয়েছে। এক নম্বর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীর জীবাণু রোগ সৃষ্টিতে অপারগ, তাই এগুলো স্বাস্থ্যবান মানুষ ও পশুর জন্য ক্ষতিকর নয়। দু নম্বর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণী মানুষ ও পশুর মধ্যে রোগ সৃষ্টি করতে সমর্থ, তবে তা খুব কমই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এগুলোর কার্যকর চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় রয়েছে এবং সংক্রমণের বিস্তারও সীমিত। তিন নম্বর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণী মানুষ এবং পশুর মধ্যে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে, তবে সাধারণভাবে আক্রান্তের কাছ থেকে এটি ছড়ায় না। এই শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট রোগের কার্যকর চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের উপায় রয়েছে। চার নম্বর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীর জীবাণু সাধারণত মানুষ ও পশুর মধ্যে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে এবং অনায়াসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্তের কাছ থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট রোগের কোনো কার্যকর প্রতিষেধক এবং চিকিৎসা নেই (১,২)। এ-ধরনের রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গবেষণা এবং রোগ নির্ণয়কারী গবেষণাগারসমূহে জীবের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং/অথবা জৈব-সতর্কতামূলক নীতিমালা এবং পদ্ধতি চালু থাকা প্রয়োজন (১,২)।

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীর জীবাণুর সংক্রমণের ভিন্নতা এবং সংক্রমণের পথ ভিন্ন হওয়ার ফলে গবেষণাকর্মীদের মধ্যে রোগজীবাণুর সংক্রমণ সীমিতকরণ ও প্রতিরোধের লক্ষে এবং পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া রোধকল্পে তাদেরকে কাজের অভ্যাসের সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং গবেষণাগারে নিরাপত্তা রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন (১,২)। রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণুর ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী এক থেকে চার স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১,২)। সাধারণত এক থেকে চার স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারসমূহ যথাক্রমে এক থেকে চার নম্বর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীর জীবাণু পরীক্ষার জন্য সহায়ক। তবে গবেষণাগারসমূহে ঝুঁকির মাত্রা যেহেতু বাড়ছে (যেমনটি চিত্র ১-এ লাল ছায়া হিসেবে প্রত্যেক আরজিতে দেখানো হয়েছে), সেহেতু ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী গবেষণাগারসমূহে সাধারণত যে স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকার কথা তার থেকে উঁচু স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারের নীতিমালা ও পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে, উঁচু স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে

*চিত্র ১: ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রামক জীবাণুর শ্রেণীসমূহ এবং জীবাণুগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান ও যন্ত্রপাতিসম্বলিত বিএসএল১ ও বিএসএল২ এবং আরো উন্নত সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত বিএসএল৩ ও বিএসএল৪ গবেষণাগারসমূহ**

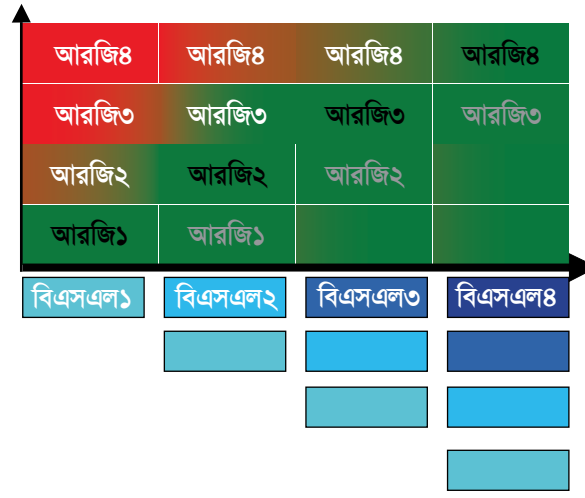

*নিরাপত্তার স্তরসমূহ: ১) গবেষণাগারের মৌলিক আচরণসমূহ ও প্রাক-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা; ২) জৈব-সতর্কতামূলক চিহ্ন, অ্যারোসল সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য জৈব-সতর্কতামূলক (বায়োসেফটি) ক্যাবিনেট, বর্জ্য-শোধনের জন্য জীবাণুনাশক যন্ত্র (অটোক্লেভ); ৩) বায়ু-বাহিত রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ-সংক্রান্ত প্রাক-সতর্কতা, নিয়ন্ত্রণমূলক প্রাক-সতর্কতা এবং ধারাবাহিক ধনাত্মক চাপ; এবং ঋণাত্মক চাপ-সংক্রান্ত পরিচ্ছদ এবং আলাদা ইমারত।

কর্মঅভ্যাসের সাথে কর্মীদের বাড়তি সম্পৃক্ততা এবং নিরাপত্তা প্রদানকারী যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা যদিও বেড়ে যায় তথাপি, নিম্নমানের গবেষণাগারের তুলনায় এখানে কমসংখ্যক জীবাণুর চূড়ান্ত পরীক্ষা করা সম্ভব হয় (চিত্র ১-এ ধূসর ছায়ায় যেটি দেখানো হয়েছে)।

গবেষণাকর্মীদের সংক্রমণের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে সমস্ত ক্লিনিক্যাল গবেষণাগারে দ্বিতীয় বা উচ্চতর স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক নীতিমালা এবং পদ্ধতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি নমুনা থেকে যখন কোনো একটি জীবাণু এবং এর ক্ষতিকারক শ্রেণী নির্ণীত হয়, তখন সেটি নিয়ে কাজ করার জন্য পরবর্তী কর্মঅভ্যাস এবং যথার্থ জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার নির্ধারিত হয়। রোগসংক্রমণের পথ হচ্ছে জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার নির্ধারণের জন্য সবচেয়ে বড় বিবেচনার বিষয়। যদিও দ্বিতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুঁকিপূর্ণ জীবাণু নিয়ে কাজ করা হয়, তথাপি কম শক্তিশালী সংক্রামক জীবাণুসহ অনেকগুলো জীবাণু নিয়ে যখন কাজ করা হয় অথবা অনেক বেশি কালচার থাকে, এবং যখন যান্ত্রিকভাবে অ্যারোসল তৈরি হয় ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবাণুর সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে, তখন তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে কাজ করা উচিত (১,২)। অ্যারোসল-সংক্রামিত তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষতিকর জীবাণুর জন্য সাধারণত তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার ব্যবহার করতে বলা হয় (১,২)। তবে জৈব নমুনার ঘনত্বের ফলে অ্যারোসলের মাধ্যমে জীবাণুর সংক্রমণ যখন কঠিন হয়, তখন তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারের কর্মপদ্ধতি এবং সুবিধা অবলম্বন করে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি (পিপিই) ব্যবহার করে দ্বিতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে তা পরীক্ষা করা যেতে পারে (৪)। প্রাদুর্ভাবের মত অবস্থায় সংক্রমণ যখন মারাত্মক থাকে অথবা তাতে আক্রান্ত মানুষ মারা যেতে পারে অথচ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অজানা থাকে, তখন রোগ সনাক্তকরণের জন্য বর্ধিত সুবিধা এবং যন্ত্রপাতিসম্বলিত তৃতীয় বা তদুর্ধ্ব স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে জীবাণু নিয়ে গবেষণা করা উচিত (৫-৯)।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ (এনআইএইচ)-এর কাছ থেকে পাওয়া একটি নকশা অনুযায়ী আইসিডিডিআর,বি ৬০ বছরের পুরনো একটি দালানে অবস্থিত একটি চালু গবেষণাগারকে সংস্কার করে তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে রূপান্তরিত করেছে। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)/ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর বিএমবিএল (মাইক্রোবায়োলোজি এবং বায়োমেডিকেল গবেষণাগারের জৈব-সতর্কতা) নীতিমালার পঞ্চম সংশোধনী এবং সিডিসির তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারের নীতিমালা অনুসরণ করে সাফল্যের সাথে এখানে তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত এবং সনদপ্রাপ্ত হয়েছে (১,২)। গবেষণাগারটিকে ৫টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে (চিত্র ২এ)। এখানে ঋণাত্মক চাপের যে প্রবাহ থাকে তা অন্তর্মুখী বাতাসের একটি প্রবাহ তৈরি করে, যা বায়ুসংক্রমণে পারদর্শী জীবাণু গবেষণাগার থেকে বাইরে নির্গমনে বাধা প্রদান করে। গবেষণাগারটির মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে তাপমাত্রা এবং চাপ ঠিক রাখার জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি পার্শ্ব পাখা (সাপ্লাই সাইড ফ্যান) ধুলামুক্ত পরিষ্কার বাতাসের যোগান দেয় এবং অতিশয় কার্যকর কণা-ছাকনির (পার্টিকিউলেট ফিল্টার) মাধ্যমে কক্ষের বাতাস ছেকে বের হয়ে যায়। এই ছাকনি সব ধরনের সংক্রামক উপাদান ছেকে রাখতে এবং চারপাশের পরিবেশের মধ্যে নির্গত হওয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম। গবেষণাগারটিতে সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য এটি সুপারিশকৃত সব ধরনের যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ (১,২)। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের যন্ত্রপাতি, কক্ষের অর্ধেক আলো, এবং জরুরী ব্যবস্থাসমূহে সব সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখা হয়। এছাড়া, গবেষণাগার কক্ষে গমন-নির্গমন ব্যবস্থায় এর নিজস্ব ব্যাটারি আছে।

তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার তৃতীয় শ্রেণীর ঝুঁকিপূর্ণ জীবাণুর কালচার, জীবাণুনাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) ওষুধের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা এবং নিউক্লিক এসিড পৃথককরনের জন্য উপযোগী একটি গবেষণাগার। এখানে যেকোনো উপাদানই প্রবেশ করুক না কেন তা একটি উপযুক্ত সংক্রমণমুক্ত (স্টেরিলাইজেশন) পদ্ধতিতে অটোক্লেভ বা সারফেস স্টেরিলাইজেশনের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বিএসএল৩-এর মধ্যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সংক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য গাওন, মাথা-ঢাকনি, জুতা-ঢাকনি, মাস্ক, গ্লাভস এবং রংগিন চশমাসহ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদির (পিপিই) ব্যবহার অত্যাবশ্যক। পোশাক পরিবর্তনের কক্ষটি একটি আধা-সংক্রামিত এলাকায় অবস্থিত এবং পিপিই পরিত্যাগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসম্বলিত। অটোক্লেভ কক্ষটি একটি সংক্রমণমুক্ত এলাকায় অবস্থিত যেখানে অব্যবহৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি রাখা থাকে এবং সংক্রামিত এলাকায় (হট জোন) প্রবেশের পূর্বে যেকোনো ধরনের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এখানে রেখে যেতে হয়। অটোক্লেভের ভিতর থেকে সংক্রমণমুক্ত আবর্জনা বেরিয়ে পরিষ্কার এলাকায় আসে।

চিত্র ২এ: আইসিডিডিআর,বি-র বিএসএল৩ ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃতযন্ত্রপাতি এবং সুবিধাদি

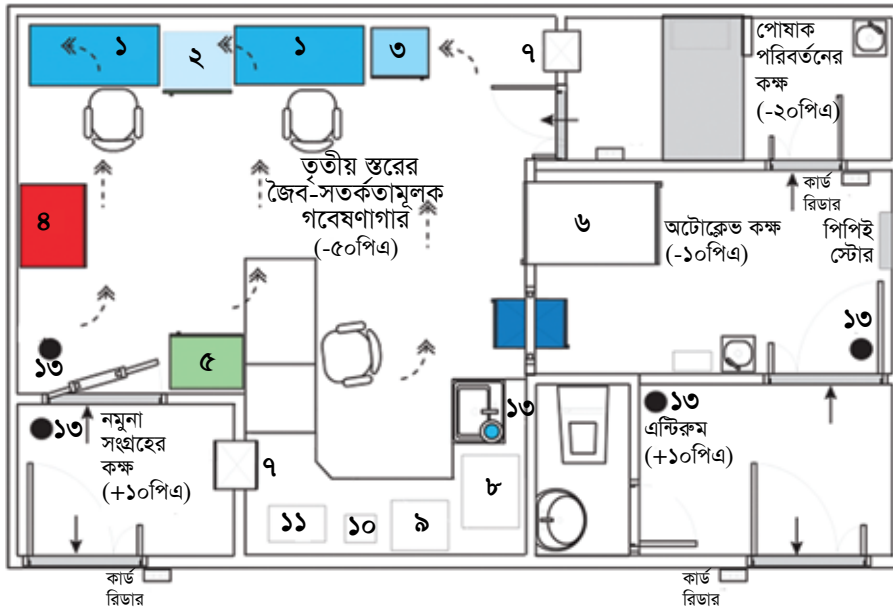

যন্ত্রপাতি: জৈব-সতর্কতামূলক কেবিনেট [১], -৮০ ফ্রিজার [২], রিফ্রিজারেটর [৩], এমজিআইটি [৪], কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইনকিউবেটর [৫], অটোক্লেভ [৬], পাস-বক্স [৭], ওয়াটার বাথ [৮], টেবিলটপ সেন্ট্রিফিউজ [৯], ছোট্ট ইনকিউবেটর [১০], মাইক্রো-সেন্ট্রিফিউজ [১১], সিঙ্কসহ আইওয়াশ [১২], ক্যামেরা [১৩]।

তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারের ব্যবহারকারীগণ এর ভিতরে সব ধরনের কার্যক্রমের জন্য এখানকার সুবিধা, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদির ব্যবহার এবং গবেষণাগারের আদর্শ ব্যবহারবিধির ওপর পূর্ণ মাত্রার জৈব-সতর্কতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। সেখানে কর্মরত সবাই গবেষণাগারে প্রবেশের মুখে কক্ষচাপ পরিমাপক যন্ত্রে কক্ষের চাপ দেখে সেখানে রাখা একটি লগবইতে লিখে রাখেন। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত যে চাপের হিসাব দেখানো হয়েছে তা নির্দেশ

করে যে, গবেষণাগারের বিভিন্ন কক্ষে ধারাবাহিক ঋণাত্মক চাপের ভিন্নতা বজায় ছিলো (চিত্র ২বি)।

জীবাণু সনাক্তকরণের জন্য মাইকোব্যাক্টেরিয়াম পরীক্ষা, কালচার, নিউক্লিক এসিড আলাদাকরণ এবং ওষুধের সংবেদনশীলতা পরীক্ষার জন্য গবেষণাকারীদের দ্বারা বর্তমানে গবেষণাগারটি প্রতিদিন আনুমানিক দুই থেকে ছয় ঘণ্টা করে সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিদিন সাত থেকে আটটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়: এগুলোর মধ্য থেকে ১০% রোগসৃষ্টিকারী মাইকোব্যাক্টেরিয়াম পাওয়া যায়। কঠিন আবর্জনা ডাবল বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে ভরে অটোক্লেভের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তা পরিত্যাগের পূর্বে স্থানীয় নীতিমালা অনুযায়ী জীবাণুমুক্ত করা হয়। শতকরা একভাগ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্বারা গলিত আবর্জনা জীবাণুমুক্ত করা হয়। পুনঃব্যবহার্য দ্রব্যাদিও অটোক্লেভ করা হয় এবং ব্যবহারের পূর্বে ধুয়ে নেওয়া হয়। যেখানে কাজ করা হয় তার উপরিভাগের সব স্থান ব্যবহারের আগে এবং পরে ০.৫% হাইপোক্লোরাইট দ্বারা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। জৈব-সতর্কতামূলক ক্যাবিনেটের উপরিভাগ ১% হাইপোক্লোরাইট দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং এরপর ৭০% ইথানল দিয়ে হাইপোক্লোরাইটের অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করা হয় যাতে উপরিভাগের স্টেইনলেস স্টিলে মরিচা না ধরে। জৈব-সতর্কতামূলক কর্মসূচি এবং গবেষণাগারটি প্রতিবছর একটি যোগ্যতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নতুন করে যোগ্যতার সনদ সংগ্রহ করবে।

চিত্র ২বি: বিএসএল৩-এর অভ্যন্তরের তিনটি অংশে ঋণাত্মক চাপ প্রবাহের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা

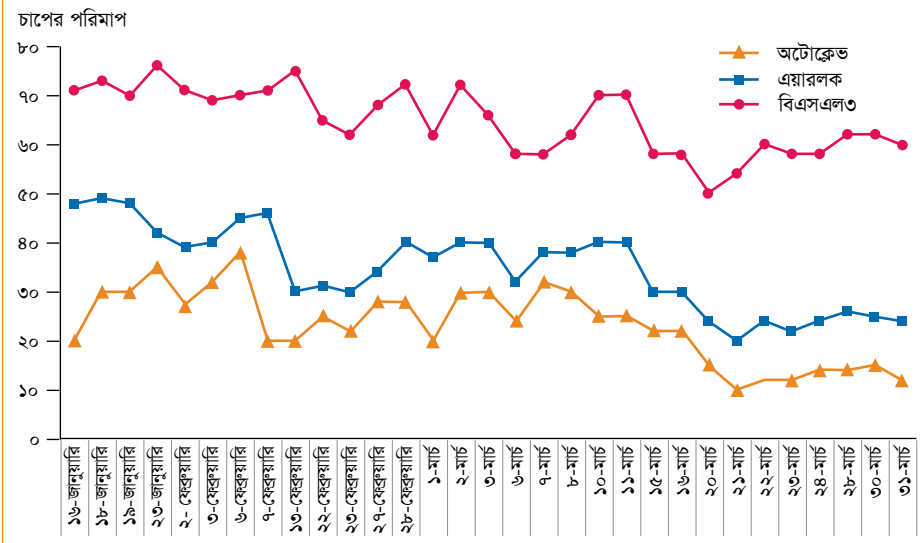

প্রতিবেদন: বায়োসেফটি প্রোগ্রাম এবং বায়োসেফটি লেবেল ৩ ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিসন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেশন, ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, ইউএসএ; এশিয়া প্যাসেফিক বায়োসেফটি অ্যাসেসিয়েশন; ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর বায়োসেফটি অ্যাসোসিয়েশন।

মন্তব্য

বাংলাদেশের গবেষণাগারসমূহে অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি বা সুবিধা নিয়ে মৃদু এবং মারাত্মক সংক্রামক জীবাণুর ওপর গবেষণা এবং রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি বিএসএল৩ রয়েছে (চিত্র ৩) – একটি ইতোমধ্যে সনদপ্রাপ্ত এবং আইসিডিডিআর,বিতে অবস্থিত এবং অপরটি রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এ অবস্থিত যা এখনো নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয় না। এই গবেষণাগারসমূহ আগেভাগে নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে আরো গবেষণা চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। আমরা মনে করি আইসিডিডিআর,বিতে অবস্থিত তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে বহু ওষুধপ্রতিরোধী যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুর অভিনব প্রজাতি এবং প্রাদুর্ভাব সৃষ্টিকারী অজানা কোনো রোগ নির্ণয়ের মতো তিনটি বড় কাজ করা যাবে।

চিত্র ৩: বিশ্বব্যাপী জৈব-সতর্কতামূলক বা নিয়ন্ত্রণমূলক গবেষণাগারসমূহের অবস্থান

বাংলাদেশে দুটি বিএসএল৩ ল্যাবরেটরি দেখানো হয়েছে, যার একটি আইসিডিডিআর,বিতে এবং অপরটি আইইডিসিআর-এ অবস্থিত। নিরাপত্তাজনিত কারণে শুধুমাত্র কিছু ল্যাবরেটরির অবস্থান দেখানো হলো। ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সিডিসির তালিকাভুক্ত মোট ১,৩৫৬ টি বিএসএল৩ রয়েছে (১০)। অন্যান্য দেশের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০টি, ভারতে ১৬টি, সিংগাপুরে ১০টি, থাইল্যান্ডে ৫টি, ইন্দোনেশিয়ায় ২টি এবং মায়ানমারে ১টি রয়েছে।

যক্ষ্মা রোগে সবচেয়ে ঝুঁকিবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি (১১)। বাংলাদেশে চরম-ওষুধপ্রতিরোধী জীবাণুসমূহের উত্থান এবং এইচআইভি-র সাথে সেগুলোর সম্ভাব্য সহ-সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে যক্ষ্মার মারাত্মক নতুন প্রজাতি মাইকোব্যাক্টেরিয়াম যক্ষ্মার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার ইংগিত বহন করে। সঠিক ব্যবস্থাপনাসমৃদ্ধ একটি তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগার দেশের মধ্যে উত্থিত নতুন প্রজাতির জীবাণু নির্ণয় করে এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধ করতে পারে।

উচ্চমাত্রায় রোগসৃষ্টিতে পারদর্শী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচপিএআই) এইচ৫এন১ ভাইরাস ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশের হাঁস-মুরগীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত তিনজন এইচ৫এন১-এ আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে (৮)। যে রিভার্স-ট্রান্সক্রিপ্ট পলিমিরেজ চেইন রিয়াকশন (আরটি-পিসিআর) পদ্ধতিতে এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা পরীক্ষা করা যায়, সেরকম একটি পদ্ধতিতে তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারে পরীক্ষা করে তা নিশ্চিত করা যায়। তবে আরো গভীরভাবে গবেষণার জন্য এইচ৫এন১ ভাইরাল কালচার তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক

গবেষণাগারের বর্ধিত সুবিধায় করা উচিত (৫)।

গত দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংক্রামক রোগের অনেকগুলো প্রাদুর্ভাব নির্ণীত হয়েছে (৬-৮)। দেশের বাইরে নমুনা পাঠানো যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং পৃথিবীব্যাপী জৈব-নিরাপত্তার ওপর ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ (৯)। প্রাদুর্ভাব-সৃষ্টিকারী নমুনার নিশ্চিত চুড়ান্ত পরীক্ষা এবং তা থেকে রোগ নির্ণয় আর একটি জাতীয় অবদান যা এই গবেষণাগার এখন করতে সক্ষম (৯)।

রোগের ওপর নজরদারি, রোগ নির্ণয় এবং এই অঞ্চলে বিরাজমান সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি নিরসনের জন্য দক্ষ অণুজীব গবেষণাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, অথচ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত এ-ধরনের গবেষণাগার বর্তমানে নেই। আইসিডিডিআর,বিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন সনদপ্রাপ্ত তৃতীয় স্তরের জৈব-সতর্কতামূলক গবেষণাগারের মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের দক্ষতা আরো এক ধাপ উন্নীত হলো।

References

1. Chosewood LC, Wilson DE, editors. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. 5th ed. Washington, DC: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, 2009. 415 p. (http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf, accessed on 28 June 2009).
2. World Health Organization. Laboratory biosafety manual. 3rd ed. Geneva: World Health Organization, 2004. 178 p. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546506.pdf, accessed on 26 April 2009).
3. National Institute of Health. NIH guidelines for research involving recombinant DNA molecules (NIH guidelines): May 2011. (http://oba.od.nih.gov/oba/rac/Guidelines/NIH_Guidelines.pdf, accessed on 23 July 2010).
4. Vincent V, Paramasivan CN, Gilpin C , Cirillo D, Joly J, Allen J *et al*. Summary report: guidance on biosafety related to TB laboratory diagnostic procedures, 8-9 April 2009, Geneva, Switzerland. (http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/Summary%20April%2009.pdf, accessed on 25 October 2010).
5. Centers for Disease Control and Prevention. Updated interim guidance for laboratory testing of persons with suspected infection with highly pathogenic Avian influenza A (H5N1) virus in the United States. February 20, 2009. (http://www.cdc.gov/flu/avian/professional/guidance-labtesting.htm, accessed on 25 October 2010).
6. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Combined team of ICDDR,B and Government of Bangladesh investigators reveal dynamics of anthrax outbreaks in Bangladesh during 2009-2010. (http://www.icddrb.org/media-centre/news/2203-combined-team-of-icddrb-and-government-of-bangladesh-investigators-reveal-dynamics-of-anthrax-outbreaks-in-bangladesh-during-2009-2010, accessed on 26 July 2011).
7. Stone R. Epidemiology. Breaking the chain in Bangladesh. *Science* 2011;331: 1128-31.
8. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Outbreak of mild respiratory disease caused by H5N1 and H9N2 infections among young children in Dhaka, Bangladesh. *Health Sci Bull* 2011;9:5-12.

9. Sewell DL. Laboratory safety practices associated with potential agents of biocrime or bioterrorism. *J Clin Microbiol* 2003;41:2801-9.

10. United States Government Accountability Office. Testimony Before the Subcommittee on Oversight and Investigations, Committee on Energy and Commerce, House of Representatives. High-containment biosafety laboratories: preliminary observations on the oversight of the proliferation of BSL3 and BSL4 laboratories in the United States; Statement of Keith Rhodes, Chief Technologist. Center for Technology and Engineering Applied Research and Methods. Washington, DC: United States Government Accountability Office, 2007 (http://www.gao.gov/new.items/d08108t.pdf, accessed on 20 April 2010).

11. Integrated Regional Information Networks. Bangladesh: TB rates plummet, but still high among poor and uneducated: IRIN humanitarian news and analysis. (http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=90032, accessed on 11 July 2011).

বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের প্রাদুর্ভাব

২০০৬ এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশে নিরাময়যোগ্য একধরনের পক্ষাঘাতজনিত রোগের (গিয়েন-বারে সিনড্রোম) প্রদুর্ভাবের পরিসংখ্যান নির্ধারনের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের স্বল্পমেয়াদী শিথিল পক্ষাঘাত (অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস)-সংক্রান্ত সক্রিয় সার্ভিলেন্সের উপাত্ত ব্যবহার করেছি। গিয়েন-বারে সিনড্রোমের স্থূল হার ছিলো বছরে ১০০,০০০ জনে ১.৫-১.৭ জন। ২০০৬ সালের জুলাই থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত আমরা উচ্চ পর্যায়ের তিনটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি সম্ভাব্য কেস-কন্ট্রোল গবেষণা পরিচালনা করেছি। গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্তদের অধিকাংশেরই শুধুমাত্র মাংসপেশীর সঞ্চালক স্নায়ু (পিওর মটর) এবং বহিঃস্নায়ু বা স্নায়ুকোষের প্রান্তগঅংশ (অ্যাক্সোনাল) আক্রান্ত ছিলো। গিয়েন-বারে সিনড্রোমের মধ্যে *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি* ছিলো অন্যতম (৫৭%) পূর্ববর্তী সংক্রামক জীবাণু। অ্যাক্সোনাল ধরনের গিয়েন-বারে সিনড্রোম *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র সংক্রমণ, রোগপরবর্তী মারাত্মক শারীরিক অক্ষমতা এবং উচ্চ মৃত্যুহারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো।

গিয়েন-বারে সিনড্রোম স্নায়ুমূলসমূহে তীব্র প্রদাহজনিত (পলির‍্যাডিকুলোনিউরোপ্যাথি) একটি রোগ এবং বিশ্বব্যাপী বয়স্ক এবং শিশুদের মধ্যে অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিসের সবচেয়ে বড় কারণ (১)। গিয়েন-বারে সিনড্রোমের প্রাথমিক লক্ষণ হলো স্বল্পসময়ের মধ্যে বাড়তে থাকা মাংসপেশীর দুর্বলতা যেখানে বোধহীনতা থাকতে পারে বা নাও পারে। কিছুসংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা এতটাই তীব্র হয় যে, তা তার শ্বাসতন্ত্রকে অচল করে দিতে পারে। চোখে একটি বস্তুকে দুটো দেখা এবং খাদ্য গিলতে অসুবিধা মাথার খুলির স্নায়ুদৌর্বল্যের ইংগিত বহন করে। অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত লক্ষণসমূহ হচ্ছে অসাড়তা, অনুভূতির পরিবর্তন (পারেসথেসিয়া), ব্যাথা এবং পেশীসমূহের ভারসাম্যহীনতা (অ্যাটাক্সিয়া)। ব্যাথা হচ্ছে এ-রোগের প্রাথমিক উপসর্গ এবং তা শিশুদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের অকার্যকারিতার ফলে রক্তচাপে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় বা হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক স্পন্দনের ছন্দপতন ঘটে (অ্যারিথমিয়া)। স্নায়ুতান্ত্রিক পরীক্ষায় সাধারণত শরীরের উভয় অংশের মাংসপেশীর দৌর্বল্য এবং অনুভূতিহীনতা পাওয়া যায়, যদিও কেবলমাত্র এই লক্ষণগুলোই সুনির্দিষ্টভাবে গিয়েন-বারে সিনড্রোমকে চিহ্নিত করে না। সাধারণত রোগের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে স্নায়ুরসে বর্ধিত হারে প্রোটিন পাওয়া যায়। ইলেক্ট্রোফিজিওলোজি পরীক্ষায় তিন প্রজাতির গিয়েন-বারে সিনড্রোম পাওয়া যায়, যথা - তীব্র প্রদাহজনিত ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি,

তীব্র মটর অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি এবং মটর ও অনুভূতিজনিত অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রোগীর কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে গিয়েন-বারে সিনড্রোম দেখা দেওয়ার পূর্বে তারা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলো। নির্ণীত পূর্ববর্তী সংক্রমণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি* (২-৪)। *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র সংক্রমণ মারাত্মক, পিওর মটর, ও অ্যাক্সোনাল-এর তারতম্যজনিত গিয়েন-বারে সিনড্রোমের সাথে সম্পর্কিত (২,৫,৬)। *সি. জেজুনি*-র নির্দিষ্ট প্রজাতির সংক্রমণ স্নায়ুগ্রন্থিতে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যার ফলে স্নায়ু নষ্ট হয়ে যায় (৭)।

বাংলাদেশ পলিওমাইলাইটিস দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০০ সাল থেকে এ-পর্যন্ত মোট ১৮ জন রোগীর একটি ক্লাস্টার আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং এ-রোগ ভারতবর্ষ থেকে এসেছে বলে মনে হয়। তবে ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশে অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিসের হার ১৫ বছরের কম-বয়সী প্রতি ১০০,০০০ জন শিশুর মধ্যে ছিলো ৩.৫ জন (৮)। এই নিবন্ধ বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের ওপর সম্প্রতি প্রকাশিত নিবন্ধের সারসংক্ষেপ (৯,১০)। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো ২০০৬-২০০৭ সালে ১৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ওপর পরিচালিত অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস-সংক্রান্ত সার্ভিলেন্সের উপাত্ত থেকে বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের স্থূল হার বের করা, এবং হাসপাতালভিত্তিক একটি সম্ভাব্য গবেষণা থেকে *সি. জেজুনি*-র পূর্ব-সংক্রমণ, ক্লিনিক্যাল ফেনোটাইপ এবং গিয়েন-বারে সিনড্রোমের সম্ভাব্য গতিধারা নির্ণয় করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস-এর ওপর একটি সার্ভিলেন্স কর্মসূচি বর্তমানে চালু রয়েছে। পনর বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়া বিশেষ অংশের বা সর্বশরীরের ফ্লাসিড দুর্বলতাকে সাধারণত অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস হিসেবে ব্যাখা করা হয়। সার্ভিলেন্স কর্মসূচি থেকে নিয়মিতভাবে সংগৃহীত ক্লিনিক্যাল এবং অন্যান্য তথ্যাবলির ওপর ভিত্তি করে আমরা গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত একজন রোগীর যে সংজ্ঞা দিয়েছি তা হলো – ১৫ বছরের কম-বয়সী অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিসে আক্রান্ত যে শিশুর শরীরের দুই পাশ একইভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলো, তবে সে কখনো আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি বা জন্মগত আঘাতের কোনো ইতিহাসও ছিলো না। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত ১৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে আমরা ছয়টি বিভাগ এবং ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটিতে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের স্থূল হার বের করেছি।

জাতীয় সার্ভিলেন্স কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০৬ সালে ১,৬১৯ জন অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ৬০৮ জন (৩৭%) রোগীর লক্ষণ গিয়েন-বারে সিনড্রোমের লক্ষণের সাথে মিলে যায়। ২০০৭ সালে ৪৬% (৮৫৫/১,৮৪৪) রোগীর লক্ষণ ছিলো গিয়েন-বারে সিনড্রোমের অনুরূপ। বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগে ১৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের স্থূল হার ছিলো বছরে প্রতি ১০০,০০০ জনে ১.৫ থেকে ২.৫ জন। এই হার উত্তরাঞ্চলীয় তিনটি বিভাগে (ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেট) ১.৫ থেকে ১.৭ জন এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় তিনটি বিভাগে (খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম) ছিলো ২.১ থেকে ২.৫ জন (৯)। এ-হার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত মেহেরপুর এবং বরিশাল জেলায় (বছরে ১০০,০০০ জনে >৫.০ জন (চিত্র ১)।

২০০৬ সালের জুলাই থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালে বিরামহীনভাবে চিকিৎসাধীন ১০০ জন গিয়েন-বারে সিনড্রোমের রোগীসহ আমরা একটি কেস-কন্ট্রোল গবেষণাও পরিচালনা করেছি। হাসপাতালে ভর্তি একজন রোগীকে যখন গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত মনে হয়েছে, তখন দুদিনের

মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ তাকে পরীক্ষা করে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের ওপর প্রণীত ন্যাশনাল নিউরোলোজিক্যাল ডিজঅর্ডারস এবং স্ট্রোকের মানদণ্ড অনুযায়ী রোগ নিশ্চিত করেছেন।

চিত্র ১: ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের স্থূল হার (প্রতি ১০০,০০০/বছর)

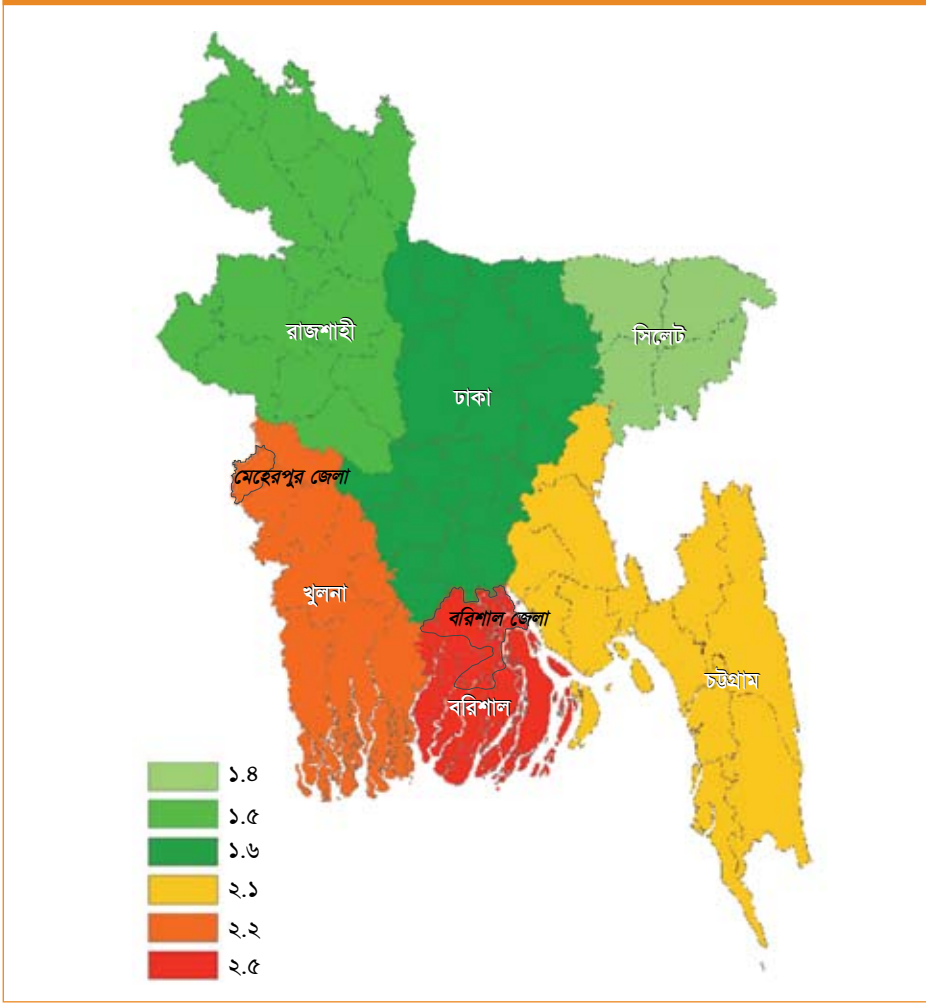

গিয়েন-বারে সিনড্রোম গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী যুবকদের মধ্যে বেশি দেখা গেছে (সারণি ১)। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় জানুয়ারি এবং মার্চ মাসে বেশি রোগী সনাক্ত করা হয় (চিত্র ২)। শতকরা ঊনসত্তর জন রোগীর ক্ষেত্রে পূর্ব-সংক্রমণের ডাক্তারী প্রমাণ ছিলো। সবচেয়ে বেশি ছিলো ডায়রিয়ার লক্ষণ (৩৬%)। বেশিরভাগ রোগী (৯২%) শুধুমাত্র মটরনার্ভে দুর্বলতাজনিত গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিলো, যেখানে মাথার খুলির (ক্রানিয়াল নার্ভ) স্নায়ুদৌর্বল্যের হার ছিলো কম

(৩০%)। শতকরা ২৫ জন রোগীর কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজন ছিলো। ইলেকট্রোফিজিওলোজিক্যাল পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদের ৬৭% রোগী অ্যাক্সোনাল-ধরনের গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিলো। রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে (ফলোআপ) ১১ জন (১৪%) রোগীর মারা যাওয়ার খবর এবং ২৩ জনকে (২৯%) আগের মতো মারাত্মকভাবে অক্ষম অবস্থায় পাওয়া গেছে। সম্প্রতি গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করে ৫৭%-এর মধ্যে *সি. জেজুনি*-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে এবং এর বিপরীতে ৮% পাওয়া গেছে পরিবারের মধ্যে এবং ৩% অন্যান্য স্নায়ুতান্ত্রিক রোগে আক্রান্ত নিয়ন্ত্রিত রোগীদের মধ্যে (পি <০.০০১)। রক্তরসে বিশেষ গ্যাংলিওসাইড (স্নায়ুকোষ বা এর বর্ধিত অংশে অবস্থিত বস্তু, যেমন - জিএম১ এবং জিডি১এ, ইত্যাদি)-এর বিপরীতে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি, অ্যাক্সোনাল বৈকল্য এবং মারাত্মক শারীরিক অক্ষমতা *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র সংক্রমণের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। গিয়েন-বারে সিনড্রোমের ফলে শারীরিক অক্ষমতা-পরিমাপক সারণি অনুযায়ী রোগীর গবেষণায় অন্তর্ভুক্তিকালীন অসুস্থতার তীব্রতা, পূববর্তী ডায়রিয়ার সংক্রমণ ও রক্তরসে *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র সংক্রমণের আলামত তার রোগপরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অক্ষমতার সংগে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

চিত্র ২: মৌসুম অনুযায়ী ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের বিন্যাস

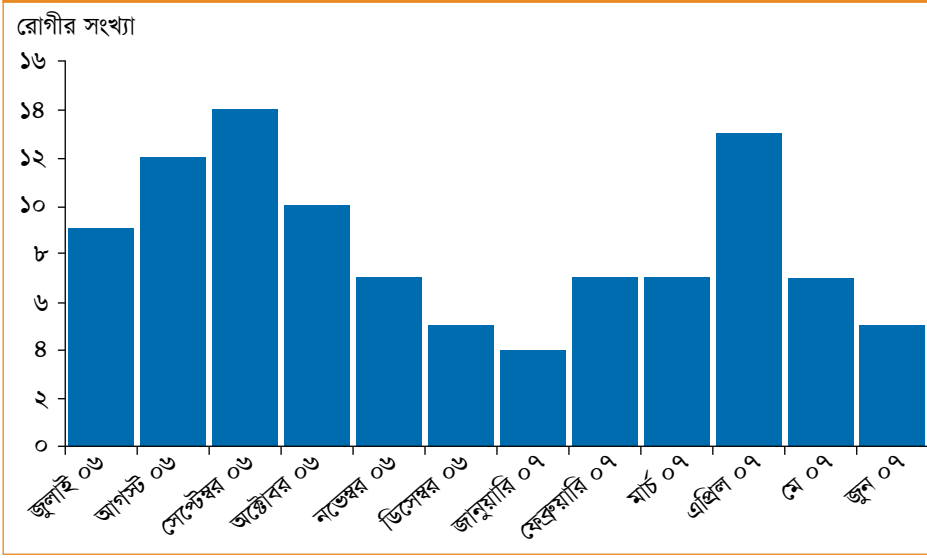

প্রতিবেদক: এন্টারিক অ্যান্ড ফুড মাইক্রোবায়োলোজি ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি; ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; এরাসমাস এমসি, রটারডাম, দ্যা নেদারল্যান্ডস ।

প্রতিবেদক: আইসিডিডিআর,বি; ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এবং এরাসমাস, রটারডাম, দ্যা নেদারল্যান্ডস।

সারণি ১: গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্তদের জনমিতিক, ক্লিনিক্যাল এবং ইলেকট্রোফিজিওলোজিক্যাল বৈশিষ্ট্যসমূহ

জনমিতিক	
লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা)	৭২/২৮
মধ্যমা বয়স, বছর (রেঞ্জ)	২১ (২.০-৬৫.০)
বয়সের বিন্যাস (বছর)[1]	
<১৫	২৬ (২৬%)
১৬-৩০	৪৭ (৪৭%)
৩১-৪৫	১৯ (১৯%)
>৪৫	৮ (৮%)
অঞ্চল	
গ্রামীণ	৭১ (৭১%)
শহুরে	২৯ (২৯%)
পূর্ববর্তী লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ[2]	
ডায়রিয়া	৩৬ (৩৬%)
শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত উপসর্গসমূহ	১৯ (১৯%)
জ্বর	১৪ (১৪%)
স্নায়ুরস (সংখ্যা=৭৮)	
প্রোটিনের মাত্রা >৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার	৭৭ (৯৯%)
কোষের পরিমাণ <১৫ কোষ/মাইক্রোলিটার	৭৮ (১০০%)
স্নায়ুতন্ত্র-সংক্রান্ত লক্ষণসমূহ	
মাথার খুলির স্নায়ু-বৈকল্য	
মুখের মাংসপেশীর স্নায়ুদৌর্বল্য	২৫ (২৫%)
চোখের মাংসপেশীর স্নায়ুদৌর্বল্য	৪ (৪%)
জিহ্বা ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর স্নায়ুদৌর্বল্য	১০ (১০%)
কোনো সমস্যা নেই	৭০ (৭০%)
অনুভূতি কমে যাওয়া	৮ (৮%)
ব্যাথা	১০ (১০%)
মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল প্রণীত দুর্বলতা-পরিমাপক সারণি (অন্তর্ভুক্তিকালীন)[3]	
৬০-৫১	৮ (৮%)
৫০-৪১	২১ (২১%)
৪০-৩১	১২ (১২%)
৩০-২১	১৯ (১৯%)
২০-০	৪০ (৪০%)
গিয়েন-বারে সিন্ড্রোমের শারীরিক অক্ষমতা-পরিমাপক সারণি (অন্তর্ভুক্তিকালীন)	
১ অথবা ২	১১ (১১%)
৩	১১ (১১%)
৪	৫৩ (৫৩%)
৫	২৫ (২৫%)
ইলেক্ট্রোফিজিওলোজি-র ধরন (সংখ্যা=৬৪)	
এএমএএন[4]	৩৬ (৫৬%)
এএমএসএএন[5]	৭ (১১%)
এআইডিপি[6]	১৪ (২২%)
কোনো শ্রেণীভুক্ত নয়[7]	৭ (১১%)

[1]বয়স চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে: প্রথম দল ছিলো এএফপি সার্ভিলেন্সের ভিত্তিতে ১৫ বছরের কম-বয়সী; অন্যান্য দলসমূহ ১৫ বছরের বিরতিতে প্রণীত ।

[2]দুর্বলতা শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী চার সপ্তাহে কোনো সংক্রমণের লক্ষণ ।

[3]মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল যোগফল স্কোরে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তাহলো - উর্ধ্ব ও নিম্ন বাহুর ছয়টি পেশীর যোগফল, ৬০ (স্বাভাবিক) থেকে ০ (চার হাত-পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত) ।

[4]এএমএএন: অ্যাকিউট মটর অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি; [5]এএমএসএএন: অ্যাকিউট মটর সেনসরি অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি; [6]এআইডিপি: অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি;

[7]কোনো শ্রেণীভুক্ত নয়=এএমএএন, এএমএসএএন এবং এআইডিপি-র শ্রেণীভুক্ত নয় ।

মন্তব্য

বর্তমানে চালু অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস-সংক্রান্ত সার্ভিলেন্স থেকে যখন বাংলাদেশে পোলিওর অনুপস্থিতি বোঝা যায়, তখন এই গবেষণা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, ফ্লাসিড প্যারালাইসিসে আক্রান্ত শিশুদের একটি বড় অংশ গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েন-বারে সিনড্রোমের হারে তারতম্য রয়েছে (বছরে ১.১/১০০,০০০ থেকে ১.৮/১০০,০০০) (১১)। বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের স্থূল হার অন্যান্য দেশের তুলনায় ২.৫ থেকে ৪.০ গুণ বেশি দেখা গেছে (৯)। এছাড়া, আমাদের সম্ভাব্য কেস-কন্ট্রোল গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, বেশিরভাগ আক্রান্ত রোগী ছিলো ৩০ বছরের কম-বয়সী পুরুষ, যারা পিওর মটর এবং স্নায়ুকোষের প্রান্তগঅংশে (অ্যাক্সোনাল) তারতম্য-সংক্রান্ত গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিলো। বিশেষ করে, যেসব রোগীর স্নায়ুকোষের প্রান্তগঅংশে বিকৃতিজনিত পরিবর্তন দেখা গেছে, তাদের এই অবস্থার সাথে *সি. জেজুনি*-র পূর্ব-সংক্রমণের একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে বলে আমরা বুঝতে পেরেছি। *সি. জেজুনি*-সংক্রামিত গিয়েন-বারে সিনড্রোমের হার এখানে উচ্চ-আয়ের দেশসমূহ থেকে বেশি। হতে পারে বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে *সি. জেজুনি*-র সংক্রমণের হার বেশি, যার ফলে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের হারও সেখানে বেশি। পরিবেশে *ক্যাম্পিলোব্যাকটার* প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার ব্যাপক বিস্তার রয়েছে। এ-প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া স্তন্যপায়ী প্রাণী বা পাখীদের পরিপাকনালীতে নির্বিরোধ সহাবস্থানেও থাকতে (নরমাল ফ্লোরা) পারে। (১২)। উচ্চ-আয়ের দেশসমূহে এটি বিশ্বাস করা হয় যে, *সি. জেজুনি*-তে সংক্রমামিত হাঁস-মুরগির মাংস হচ্ছে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর প্রথম বাহন, এবং এই সংক্রমণ ঘটে ত্রুটিপূর্ণভাবে কাঁচা মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা অর্ধসিদ্ধ খাবার খাওয়ার ফলে (১২)। বাংলাদেশে হাঁস-মুরগি থেকে বিস্তর রোগ ছড়ায়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ৬১% খানার মানুষ হাঁস-মুরগি পালন করে (১৩), সুতরাং গ্রামের মানুষের *সি. জেজুনি*-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীদের রোগপরবর্তী পরিণতি খুবই অসন্তোষজনক – এখানে ৪৩% রোগী মারা যায় অথবা তাদের রোগপরবর্তী মারাত্মক অক্ষমতা দেখা দেয়, যেখানে উচ্চ-আয়ের দেশে এই হার মাত্র ২০% (১০,১৪)। উচ্চমত্রায় *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র ফলে ডায়রিয়ার সংক্রমণ এবং শুরু থেকেই রোগের মারাত্মক তীব্রতা, এই দুই বৈশিষ্টের উপস্থিতি এবং অপুষ্টি, যা বাংলাদেশে খুবই স্বাভাবিক, আংশিকভাবে রোগের অসন্তোষজনক পরিণতির জন্য দায়ী (১৪)। এছাড়া, বেশিরভাগ রোগী নির্দিষ্ট আইভিআইজি (ইন্ট্রাভেনাস ইম্মিউনোগ্লোবুলিন)-এর চিকিৎসা নেয় না, কারণ এতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর জন্য ১০ লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়, যা যোগাড় করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

যদিও *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র সংক্রমণকেই বাংলাদেশে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে অন্য কোনো জীবাণুর সম্পৃক্ততাও এখানে থাকতে পারে। অণুজীব আবিষ্কারে সক্ষম উন্নত গবেষণাগার এবং আধুনিক ও শক্তিশালী রোগনির্ণয়কারী যন্ত্রের সাহায্যে গিয়েন-বারে সিনড্রোমের জন্য দায়ী অন্যান্য অজানা উপাদানও সনাক্ত করা যেতে পারে। *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-র সংক্রমণ পাওয়া যায় নি এমন গিয়েন-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে অন্যান্য গ্লাইকোকনজুগেটের বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবডি থাকতে পারে। বর্তমান মানসম্মত চিকিৎসা যেহেতু খুব ব্যয়বহুল, এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য স্বল্প-আয়ের দেশসমূহে এটি গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান নয়, সেহেতু কম খরচে চিকিৎসার নতুন উপায় উদ্ভাবন করা জরুরী। বাংলাদেশে কীভাবে মানুষ *ক্যাম্পিলোব্যাকটার জেজুনি*-তে আক্রান্ত হয় তা আরো ভালোভাবে জানতে পারলে এই সংক্রমণ ঠেকানোর উপায়ও বের করা যেতে পারে।

References

1. van Doorn PA, Ruts L, Jacobs BC. Clinical features, pathogenesis, and treatment of Guillain-Barré syndrome. *Lancet Neurol* 2008;7:939-50.
2. Rees JH, Soudain SE, Gregson NA, Hughes RA. *Campylobacter jejuni* infection and Guillain-Barré syndrome. *N Engl J Med* 1995;333:1374-9.
3. Jacobs BC, Rothbarth PH, van der Meché FG, Herbrink P, Schmitz PI, de Klerk MA *et al*. The spectrum of antecedent infections in Guillain-Barré syndrome: a case-control study. *Neurology* 1998;51:1110-5.
4. Nachamkin I, Barbosa PA, Ung H, Lobato C, Rivera AG, Rodriguez P *et al*. Patterns of Guillain-Barré syndrome in children: results from a Mexican population. *Neurology* 2007;69:1665-71.
5. Yuki N, Yamada M, Sato S, Ohama E, Kawase Y, Ikuta F *et al*. Association of IgG anti-GD1a antibody with severe Guillain-Barré syndrome. *Muscle Nerve* 1993;16:642-7.
6. Hadden RD, Karch H, Hartung HP, Zielasek J, Weissbrich B, Schubert J *et al*. Preceding infections, immune factors, and outcome in Guillain-Barré syndrome. *Neurology* 2001;56:758-65.
7. Ang CW, Yuki N, Jacobs BC, Koga M, Van Doorn PA, Schmitz PI *et al*. Rapidly progressive, predominantly motor Guillain-Barré syndrome with anti-GalNAc-GD1a antibodies. *Neurology*1999;53:2122-7.
8. World Health Organization. Immunization and vaccine development. (http://www.searo.who.int/en/Section1226.asp).
9. Islam Z, Jacobs BC, Islam MB, Mohammad QD, Diorditsa S, Endtz HP. High incidence of Guillain-Barré syndrome in children, Bangladesh. *Emerg Infect Dis* 2011;17:1317-8.
10. Islam Z, Jacobs BC, van Belkum A, Mohammad QD, Islam MB, Herbrink P *et al*. Axonal variant of Guillain-Barre syndrome associated with *Campylobacter* infection in Bangladesh. *Neurology* 2010;74:581-7.
11. McGrogan A, Madle GC, Seaman HE, de Vries CS. The epidemiology of Guillain-Barré syndrome worldwide. A systematic literature review. *Neuroepidemiology* 2009;32:150-63.
12. Schouls LM, Reulen S, Duim B, Wagenaar JA, Willems RJ, Dingle KE, *et al*. Comparative genotyping of *Campylobacter jejuni* by amplified fragment length polymorphism, multilocus sequence typing, and short repeat sequencing: strain diversity, host range, and recombination. *J Clin Microbiol* 2003;41:15-26.
13. UNICEF Bangladesh, Mitra Associates. Avian influenza knowledge, attitude and practice (KAP) survey among the general public and poultry farmers in Bangladesh. Dhaka: UNICEF, 2007.
14. van Koningsveld R, Steyerberg EW, Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA, Jacobs BC. A clinical prognostic scoring system for Guillain-Barré syndrome. *Lancet Neurol* 2007;6:589-94.

২০১১ সালে বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় কলেরার প্রাদুর্ভাব

২০১১ সালের এপ্রিল মাসে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআর,বি-র কিছু গবেষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ অনুসন্ধানী দল কিশোরগঞ্জ জেলায় তীব্র পাতলা পায়খানা বা অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়াজনিত রোগের একটি প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করে। ২০১১ সালের ১০-১৯ এপ্রিলের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা শহরের তিনটি এলাকায় ৮৪ জন মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের অতিমাত্রায় তীব্র পাতলা পায়খানা এবং তাদের রেকটাল সোয়াবের নমুনা থেকে কলেরা রোগের জীবাণু পৃথককরণ থেকে এটি নিশ্চিত হয় যে, *ভিব্রিও কলেরি* দ্বারা প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়। রোগীদের খানা থেকে সংগৃহীত ট্যাপের পানির নমুনা পরীক্ষা করে *ভিব্রিও কলেরি* সনাক্তকরণ থেকে বোঝা যায় যে, পাইপলাইনের পানির সংক্রমণই ছিলো সম্ভবত এই প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। বেশিরভাগ রোগীই বলেছে যে, তারা চাপকলের পানি পান করেছে, তবে তারা খাদ্য এবং থালাবাসন ধোয়া ও রান্নার কাজে ট্যাপের পানি ব্যবহার করেছে। এছাড়া, চাপকলের পানির স্তর নিচে নেমে চাপ কমে যাওয়ায় তা বাড়ানোর জন্য তারা চাপকলের মধ্যে ট্যাপের পানি ঢেলেছে। তুলনামূলক ছোট পৌরএলাকায় পানি সরবরাহে বিঘ্নকালীন সময়ে ক্লোরিনসহ পানি বিশুদ্ধকরণের অন্যান্য কৌশলের কার্যকারিতার ওপর গবেষণার মাধ্যমে ওইসব এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের যথোপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ৩০-৫০ লক্ষ মানুষ প্রতিবছর *ভিব্রিও কলেরি*-তে আক্রান্ত হয় এবং আনুমানিক ১২০,০০০ জন মারা যায়। ফলে বাংলাদেশসহ অনেক সল্পআয়ের দেশে, যেখানে নিরাপদ পানি এবং সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল, সেখানে এটি এখনো জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ একটি সমস্যা (১,২)। অতি সাম্প্রতিককালের আগ পর্যন্ত অনেক বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে কলেরা-সংক্রমণের ওপর কোনো প্রতিবেদন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় পাঠানো হয় নি, তবে বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় জার্নালে বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে কলেরার ওপর প্রতিবেদন ছাপা হয় (৩-৮)। বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশে ৪.৫-১০ লক্ষ মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয় (১০)।

১৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখের সংবাদপত্রে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা-পৌরসভার তিনটি এলাকার ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের খবর ছাপা হয়। এরপর ওইদিনই কিশোরগঞ্জের সিভিল সার্জন ১৬ এপ্রিল থেকে জেলা হাসপাতালে হঠাৎ করে তীব্র পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার খবর পাঠান এবং প্রাদুর্ভাবের কারণ উদঘাটনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইইডিসিআর-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯ এপ্রিল ২০১১ তারিখে আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি-র একটি যৌথ অনুসন্ধানী দল প্রাদুর্ভাবের কারণ ও সংক্রমণের পথ আবিষ্কার এবং প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের লক্ষে প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে।

প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানী দল সিভিল সার্জনের কার্যালয় পরিদর্শন করে এবং জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকার অধিবাসী, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খাবার পানির যোগান এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রাথমিক তথ্যাবলি সংগ্রহ করে। এরপর প্রাদুর্ভাব এলাকার রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য অনুসন্ধানী দল কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করে এবং নির্বাচিত কিছু রোগী, সেবাদানকারী ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী যারা রোগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো, আবাসিক চিকিৎসকসহ স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মকর্তা এবং রোগীদের চিকিৎসাসেবা

প্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য অনুসন্ধানী দল কিশোরগঞ্জের প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকাও পরিদর্শন করে।

কিশোরগঞ্জ জেলার যেসব অধিবাসী ১৬ এপ্রিল ২০১১ তারিখ থেকে তীব্র পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত (প্রতি ২৪ ঘণ্টায় যাদের প্রত্যেকের তিন বা ততোধিকবার পাতলা পায়খানা) হয়ে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলো তাদেরকে আমরা প্রাদুভাবে আক্রান্ত মারাত্মক ডায়রিয়া রোগী হিসেবে চিহ্নিত করি। ১৬-১৯ এপ্রিলের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রাদুর্ভাব-সংক্রান্ত মারাত্মক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ৮৪ জন রোগী আমরা সনাক্ত করি (চিত্র ১)। তাদের মধ্যে ৫২% (৪৪/৮৪) ছিলো পুরুষ যাদের গড় বয়স ছিলো ২১ বছর (রেঞ্জ: ৪ মাস থেকে ৮০ বছর)। আমরা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে রোগী অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত একটি পূর্ব-পরীক্ষিত মানসম্মত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে অনুসন্ধান চলাকালীন হাসপাতালে ভর্তি ২২ জন রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের আক্রান্ত তিনটি এলাকার (তারাপাশা, বয়লা এবং শাতাল) মধ্যে দুটি (তারাপাশা এবং বয়লা) আমরা পরিদর্শন করি। প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য সূত্র আবিষ্কার করার জন্য আমরা তারাপাশার ইনডেক্স রোগীসহ চারজন রোগীর আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। বয়লা এলাকায় কমপক্ষে তিনজন আক্রান্ত ছিলো এমন খানা থেকে আমরা দুজন করে রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি, যাদের সবাইকে চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পৌরসভা এবং স্বাস্থ্যখাতের স্বাস্থ্যকর্মীরা তীব্র পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত আরো রোগী অথবা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের খুঁজেছেন এবং এমন কারো সম্পর্কে জানতে পারলে তা সিভিল সার্জনকে অবহিত করেছেন। আমাদের অনুসন্ধানের পরের সপ্তাহে এরকম আর কোনো রোগী ভর্তি হলে বা অনুরূপভাবে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তা দৈনিকভিত্তিতে আইইডিসিআর-এ জানানোর জন্য আমরা সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করি। ১৯ এপ্রিলের পর আর কোনো রোগী বা মৃতের খবর পাওয়া যায় নি।

তীব্র পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত যে ২৮ জন রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, তাদের মধ্যে ৪৬% (১৩/২৮) ছিলো পুরুষ এবং তাদের গড় বয়স ছিলো ২২ বছর (মধ্যমা: ১০ বছর; রেঞ্জ: ৪ মাস থেকে ৭৫ বছর)। তাদের মধ্যে ৩৯% বাস করতো তারাপাশায়, ৩২% শাতালে এবং ১৮% বয়লায়। রোগীদের ৭৯% (২২/২৮) তাদের অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সব রোগীর কাছ থেকেই জানা যায় যে, হঠাৎ করেই তাদের তীব্র পাতলা পায়খানা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে আমাশয় দেখা যায়। অর্ধেকসংখ্যক রোগীর কাছ থেকে জানা যায় যে, হাসপাতালে ভর্তির দিন >৫০ বার তাদের পাতলা পায়খানা হয়; ৩৯% (১১/২৮) তলপেটে ব্যাথার কথা জানায় এবং ৭৫% (২১/২৮) একবারের বেশি বমি হওয়ার কথাও জানায় (রেঞ্জ: ১-১৫)। বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার ডায়রিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ রোগী ভর্তির সময় পাঁচজন রোগীর মধ্যে পানিশূন্যতা ছিলো না বলে সনাক্ত করেন, এবং ১৫ জনের অল্প পানিশূন্যতা ও আটজনের মারাত্মক পানিশূন্যতা ছিলো বলে সনাক্ত করেন। চিকিৎসকগণ জানান যে, হাসপাতালে ভর্তির পর রোগীদেরকে শিরায় কলেরার স্যালাইন এবং জীবাণুনাশক ওষুধসহ সঠিক চিকিৎসা প্রদানের পর তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ১০ এপ্রিল ২০১১ থেকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী রোগীদের ৬৮% (১৯/২৮)-এর পরিবারে কমপক্ষে আরো একজন এবং ৪৩% (১২/২৮)-এর পরিবারে দুই অথবা তার থেকে বেশি জন একই ধরনের অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিলো (রেঞ্জ: ০-৮)। শতকরা বত্রিশজন (৯/২৮) জানায় যে, তারা পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত

ট্যাপের পানি পান করেছিলো, যেখানে ৬৮% (১৯/২৮) জানায় যে, তারা শুধুমাত্র চাপকলের পানি পান করেছিলো। তবে গ্রীষ্মকালে চাপকলের পানির স্তর যখন অনেক নিচে নেমে যায় এবং তা থেকে পানি ওঠানো যায় না, তখন সাধারণত সবসময়ই মানুষ দু-তিন লিটার ট্যাপের পানি চাপকলের মধ্যে ঢেলে পানি ওঠানোর চেষ্টা করে (ছবি ১: ২৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)। এছাড়া, রোগীদের প্রায় অর্ধেকাংশ (৫৪%) জানায় যে, তারা কাঁচা খাদ্যদ্রব্য ও থালাবাসন ধোয়ার কাজে, রান্নায় এবং গোসলে ট্যাপের পানি ব্যবহার করেছে। মাত্র একজন রোগী (৪%) জানায় যে, সে সিদ্ধ করে পানি পান করেছিলো।

চিত্র ১: ২০১১ সালে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি তীব্র পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত হওয়া রোগী (সংখ্যা=২৮)

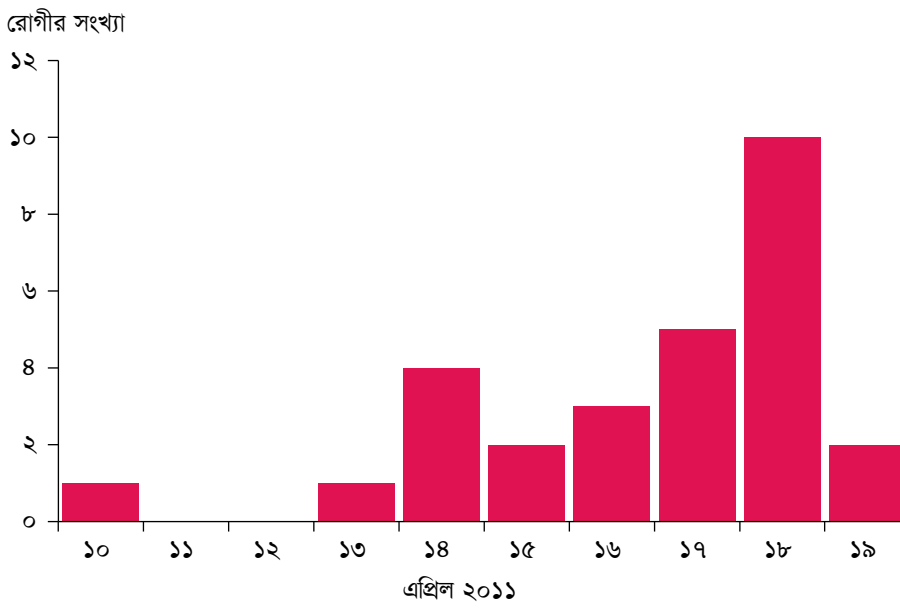

প্রাদুর্ভাবসম্পর্কিত মারাত্মক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৮ জন এবং কমিউনিটি থেকে দুজন রোগীর কাছ থেকে আমরা রেকটাল সোয়াব সংগ্রহ করি এবং জীবাণু পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পাত্রে করে তা আইইডিসিআর-এর মাইক্রোবায়োলোজি গবেষণাগারে পাঠাই। সেখানে সেগুলোর মধ্যে *ভিব্রিও কলেরি* ও১ এবং ও১৩৯, *সিগেলা* এসপিপি, *সালমোনেলা* এসপিপি বা অন্য কোনো ধরনের পরজীবী আছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। বিশটি নমুনার মধ্যে আটটি (৪০%) থেকে শুধুমাত্র *ভিব্রিও কলেরি* ওগাওয়া সনাক্ত করা হয়।

প্রাদুর্ভাবের কারণ সম্পর্কে এলাকার মানুষের মধ্যে বিরাজমান সাধারণ ভাবনাসমূহ ছিলো, প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি তাপদাহ এবং পৌরসভা কর্তৃক খোলা নর্দমায় কীটনাশক ছিটানোর ফলে খানাসমূহে মাছির উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়া। এ-ধারণার বাইরে অন্যরা মনে করে যে, প্রাদুর্ভাবের ঠিক আগে মেরামত করা পৌরসভার একটি পাম্প থেকে সরবরাহকৃত নোংরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত ট্যাপের পানি ব্যবহারের ফলে হয়তো প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়েছে। পৌরসভার যে

পাম্প থেকে প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হতো তা প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তিনমাস অকার্যকর ছিলো। তবে প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ আগে তা মেরামত করা হয়। পানির দূষণ সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ ছিলো এবং ফুটানোসহ পানি বিশুদ্ধকরণের কলাকৌশলও তাদের জানা ছিলো, তথাপি তারা কেউই পানি ফুটিয়ে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে পান করে নি। কেউ কেউ মনে করে যে, পানি ফুটানোর পর তার টাটকা ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে কোনো স্বাদ থাকে না।

প্রায় সব রোগীই প্রাথমিক পর্যায়ে বাড়িতে বসে 'ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট'-এর মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে যখন তাদের অবস্থা খারাপের দিকে গেছে, তখন তারা যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি বা বেসরকারি চিকিৎসকগণের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। কিছু চিকিৎসক কলেরাসহ তীব্র পাতলা পায়খানার সুষ্ঠু চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনার জন্য সাম্প্রতিককালে প্রণীত চিকিৎসা-ব্যবস্থার ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। এর কারণ, জীবাণুনাশক ওষুধের স্বাভাবিক অকার্যকারিতা, নির্দিষ্ট জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যবহার-সংক্রান্ত নির্দেশাবলির ঘন ঘন পরিবর্তন এবং চিকিৎসকদের দ্রুত বদলি হওয়া। চিকিৎসকগণ জানান যে, যদিও লবন-চিনি মিশ্রিত রিহাইড্রেশন সল্ট বা ওআরএস এবং শিরায় দেওয়ার স্যালাইন হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমানে ছিলো, তবে প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক ওষুধ এবং চালের তৈরি খাবার স্যালাইন ছিলো অপর্যাপ্ত।

স্থানীয় পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আমরা মূল তথ্য প্রদানকারী হিসেবে কিছু স্বাস্থ্যকর্মী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি গভীর নলকূপের মাধ্যমে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন করা হয় এবং কোনো রকম পরিশোধন ছাড়াই তা পাইপের মাধ্যমে সেখানকার খানাসমূহে সরাসরি সরবরাহ করা হয়। গভীর নলকূপ এবং পানির পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পৌরসভা কর্তৃপক্ষের। প্রতিবার প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে প্রতিদিন তিনবার করে পানি সরবরাহ করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানায় যে, প্রায় তিনমাস ধরে অকেজো থাকার পর তারা প্রাদুর্ভবের ঠিক আগে পাম্প মেরামত করেছিলো। মেরামতের পর পানি সরবরাহের পূর্বে তারা পাইপ পরিষ্কার করে নি এবং পানি পরিশোধনও করে নি। আমরা পাম্প এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে দৃশ্যমান কোনো ছিদ্রের সন্ধান পাই নি। তবে, পয়ঃনিষ্কাশন লাইন এবং পায়খানার কাছ দিয়ে পানির পাইপলাইন এবং চাপকলের অবস্থান দেখেছি এবং কোথাও কোথাও পাইপলাইন খোলা নর্দমার মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি (ছবি ১: ২৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)।

আমরা নির্বাচিত কিছু খানার ট্যাপের, আক্রান্ত যেসব রোগীর খানায় চাপকল ছিলো সেসব চাপকলের, আক্রান্ত একজন রোগীর গভীর নলকূপের, এবং পৌরসভার পাম্প ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাম্পের পানির নমুনা সংগ্রহ করি। সবগুলো নমুনাই সংগ্রহ করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইসিডিডিআর,বি-র এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলোজি গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়। পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির দুটি নমুনার মধ্য থেকেই *ভিব্রিও কলেরি* ও১ (অগাওয়া) সনাক্ত করা হয়। নয়টি নমুনার মধ্যে ছয়টি থেকে টোটাল কলিফর্ম এবং পাঁচটি থেকে ফিক্যাল কলিফর্ম সনাক্ত করা হয় (সারণি ১)।

প্রতিবেদক: রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেস, আইসিডিডিআর,বি।

অর্থাণুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র।

সারণি ১: বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত পানির নমুনার জীবাণু পরীক্ষার ফলাফল

পানি সংগ্রহের স্থান	মাত্রাতিরিক্ত জীবাণুসম্বলিত পানির নমুনার সংখ্যা (জীবাণুর ব্যাপ্তি)					
	টোটাল কলিফর্ম	ফিক্যাল কলিফর্ম	*ভিব্রিও কলেরি*	*অ্যারোমোনাস* এসপিপি.	*সিওডোমোনাস* এসপিপি.	*সালমোনেলা/ শিগেলা* এসপিপি.
নলকূপ (সংখ্যা=৫)	২, (০-২০০০)	২ (০-১০০০)	০, (০)	২, (১)	১, (১)	০, (০)
পৌর-কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত ট্যাপের পানি (সংখ্যা=২)	২, (১৩০-১৭৬০০০)	২, (১৪৭-৭৭০০০)	২, (*ভি. কলেরি* ও১ ওগাওয়া)	২, (১)	১, (১)	০, (০)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পাম্প (সংখ্যা=১)	১, (৮)	০, (০)	০, (০)	১, (১)	০, (০)	০, (০)
পৌর পাম্প (সংখ্যা=১)	১, (২৫২)	১, (১০৫)	০, (০)	১, (১)	১, (১)	০, (০)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র নির্দেশিকা অনুযায়ী পানিতে নিম্নলিখিত জীবাণুসমূহের সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা – প্রতি ১০০ মিলিলিটারে শূন্য
সিএফইউ: টোটাল কলিফর্ম, ফিকেল কলিফর্ম, *ভিব্রিও কলেরি*, *আরোমোনাস* এসপিপি, *সালমোনেলা* এসপিপি, *শিগেলা* এসপিপি, *সিওডোমোনাস* এসপিপি।

মন্তব্য

মারাত্মক পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত হওয়ার শুরু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের রোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সন্দেহভাজন রোগীদের কাছ থেকে রেকটাল সোয়াবের মাধ্যমে সংগৃহীত নমুনার ৪০%-এর মধ্যে কলেরা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রজাতীর নির্ণয় এটি প্রমাণ করে যে, কিশোরগঞ্জের একটি উপজেলার তিনটি পৌরএলাকায় তীব্র পাতলা পায়খানার প্রাদুর্ভাবটি *ভিব্রিও কলেরি*-র কারণে ঘটেছিলো।

জনস্বাস্থ্যে কলেরার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতিমালা (ইন্টরন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস) অনুযায়ী এ-রোগ এমন একটি রোগ যার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অবশ্যই জানানো উচিত। এখন পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে (১০) সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র পাঁচটি কলেরার প্রাদুর্ভাবের খবর জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা ও মতলবে অবস্থিত হাসপাতাল দুটিতে যে হাজার হাজার কলেরা রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাময়িকী *স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা*-য় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এই প্রাদুর্ভাবের সময় কোনো মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি নি, যা অন্যান্য অধিকাংশ কলেরা প্রাদুর্ভাব থেকে ভিন্ন (১০,১১)। আক্রান্ত এলাকাটি সদর হাসপাতালের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের কাছ থেকে সকল আক্রান্ত রোগীর সেবা নেওয়ার সামর্থ্য থেকে বোঝা যায় যে, ত্বরিত যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের সেরে ওঠায় সহায়তা করেছে।

একটি তাপদাহের (৭) পর কিশোরগঞ্জ পৌরসভার তিনটি এলাকায় হঠাৎকরে সন্দেহজনক একই ধরনের লক্ষণসম্বলিত কিছু ডায়রিয়ার রোগী চিহ্নিতকরণ এবং ট্যাপের পানিতে উচ্চমাত্রায় টোটাল কলিফর্ম ও *ভিব্রিও কলেরি* নির্ণয় থেকে বোঝা যায় যে, পাইপের পানির দূষণই ছিলো এই প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য কারণ। বিগত দুই বছরে পাবনা, টাঙ্গাইল এবং বগুড়ার শহরাঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসেবেও একই ধরনের উৎসের কথা জানানো হয়েছে (১০-১২), যেখানে সরবরাহকৃত পানি পর্যাপ্ত

পরিমাণ ক্লোরিন দিয়ে বিশুদ্ধ করা ছিলো না। যদিও আক্রান্ত রোগীদের ৬৮% উল্লেখ করেছে যে, তারা চাপকলের পানি পান করেছে, কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি (৫৪%) রোগী খাদ্যদ্রব্য ও থালাবাসন ধোয়া, রান্না করা এবং গোসল করাসহ গৃহের এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য কাজে পৌরসভাকর্তৃক সরবরাহকৃত ট্যাপের পানি ব্যবহার করেছে। তদুপরি, খানাসমূহের চাপকলের অভ্যন্তরস্থ পানির উচ্চতা বাড়ানের জন্য সেগুলোর মধ্যে কলেরার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত ট্যাপের পানি ঢালার ফলে উক্ত চাপকলসমূহের পানিও কলেরার জীবাণু দ্বারা দুষিত হয়ে থাকতে পারে। কলেরার জীবাণু দ্বারা ট্যাপের পানি একবার দূষিত হলে দূষিত ফল, শাক-সবজি, কাঁচা অথবা আধা-রান্না খাবারের মাধ্যমে সংক্রমণের সুযোগ অনেকাংশে বেড়ে যায় (১৩)।

যদিও আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রোগী মারা যাওয়া ও অসুস্থ হওয়ার কারণ উদরাময় রোগ (১৪) এবং শহরাঞ্চলের জনসাধারণের আন্ত্রিক সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ক্লোরিনের দ্বারা ট্যাপের পানি বিশুদ্ধ করে বা বাড়িতে পানি সিদ্ধ করে অথবা রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে পরিশোধন করে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করেছে (১৫-১৭), তথাপি না ট্যাপের পানি রাসায়নিকের সাহায্যে পরিশোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে, না বাড়িতে পানি ফুটিয়ে এবং/অথবা রাসায়নিকের সাহায্যে পরিশোধন করা হচ্ছে। পানির ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এমন একটি ধারণা বিদ্যমান যে, এটি তেমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার নয়, আর সম্ভবত এ কারণেই সরকারি সংস্থাসমূহ পানি বিষুদ্ধকরণ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব অনুভব করে না, যার ফলশ্রুতিতে জনসাধারণের মধ্যে পানি-বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে।

এই অনুসন্ধানের একটি সীমাবদ্ধতা হলো, এটি পরিচালিত হয়েছিলো শুধুমাত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের ওপর। আর তাই এই প্রাদুর্ভাবের রিপোর্টকৃত রোগীর সংখ্যা প্রকৃত রোগীর সংখ্যা থেকে কম হতে পারে। যেহেতু আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোরালোভাবে অনুসন্ধান চালাই নি, তাই আমরা হয়তো কলেরায় আক্রান্ত মৃত রোগী খুঁজে বের করতে পারি নি। তদুপরি, রোগীদের প্রায় অর্ধেকের পরিবারের দুই বা ততোধিক সদস্যের মধ্যে একই ধরনের লক্ষণ ছিলো বলে এটি বোঝা যায় যে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী থেকে কমিউনিটিতে সম্ভবত আরো বেশি কলেরায় আক্রান্ত রোগী ছিলো।

সফলভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাবের বিস্তার রোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ত্বরিত প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান; জীবাণু নির্ণয় এবং জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা জানার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা সুবিধা; জীবাণুনাশক ওষুধ এবং চালের স্যালাইনের সহজলভ্যতা; ত্বরিত রোগ-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা; এবং স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর সমন্বিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পৌর কর্তৃপক্ষের উচিত পাইপলাইনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং পাইপলাইনে সার্বক্ষণিক পানি সঞ্চালন নিশ্চিত করা যেন কম পানি সরবরাহের ফলে ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়ে বাইরের দূষিত কোনো কিছু পাইপের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। তাৎক্ষণিক প্রতিরোধমূলক কৌশল হিসেবে আক্রান্ত এলাকার জনসাধারণের উচিত অন্তত তাদের খাবার পানি ফুটিয়ে বা ক্লোরিন দিয়ে অথবা অন্য কোনো যথাযথ উপায়ে বিশুদ্ধ করে নেওয়া, যা রোগ বিস্তার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে। যেহেতু জনসাধারণ ফুটানো পানির স্বাদ পছন্দ করে না, তাই তারা ফুটানো পানি পান করার কৌশলটি গ্রহণ নাও করতে পারে।

অপেক্ষাকৃত ছোট পৌরএলাকায়, যেখানে থেকে থেকে পানি সরবরাহ করা হয়, সেখানে পানি সরবরাহ-সংক্রান্ত অবকাঠামো মেরামতের পর পানি-বিশুদ্ধকরণের কৌশল উদ্ভাবন-সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে। সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগকর্তৃক উন্নত সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা উচিত যার মাধ্যমে কলেরার প্রাদুর্ভাবসমূহ

সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে, যা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য পানি সরবরাহজনিত অবকাঠামো উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে অধিক মনোযোগদানে সহায়তা করতে পারে।

References

1. Sánchez J, Holmgren J. Virulence factors, pathogenesis and vaccine protection in cholera and ETEC diarrhea. *Curr Opin Immunol,* 2005:19;388-98.
2. Global Task Force on Cholera Control: cholera unveiled. Geneva: World Health Organization, 2003.
3. Hashizume M, Armstrong B, Hajat S, Wagatsuma Y, Faruque AS, Hayashi T *et al*. The effect of rainfall on the incidence of cholera in Bangladesh. *Epidemiology* 2008;19;103-10.
4. Hashizume M, Faruque AS, Terao T, Yunus M, Streatfield K, Yamamoto T *et al*. The Indian Ocean dipole and cholera incidence in Bangladesh: a time-series analysis. *Environ Health Perspect* 2011;119:239-44.
5. Hashizume M, Faruque AS, Wagatsuma Y, Hayashi T, Armstrong B. Cholera in Bangladesh: climatic components of seasonal variation. *Epidemiology 2010*;21:706-10.
6. Keusch GT, Fontaine O, Bhargava A, Boschi-Pinto C, Bhutta ZA, Gotuzzo E *et al*. Diarrhoeal diseases. In: Jamison DT, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB et al, editors. Disease control priorities in developing countries. New York: Oxford University Press, 2006:371:85.
7. Koelle K, Rodó X, Pascual M, Yunus M, Mostafa Golam. Refractory periods and climate forcing in cholera dynamics. *Nature* 2005;436:696-700.
8. Lipp EK, Huq A, Colwell RR. Effects of global climate on infectious disease: the cholera model. *Clin Microbiol Rev* 2002;15:757-70.
9. World Health Organization. Initiative for vaccine research (IVR): Diarrhoeal diseases. (http://www.who.int/vaccine_research/diseases/diarrhoeal/en/index3.html. accessed on 05 July 2011).
10. Institute of Epidemiology, Disease Control & Research. Outbreaks. 2011 May 2011 (www.iedcr.org, accessed on o5 July 2011).
11. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Cholera outbreak in Pabna. *Health Sci Bull* 2010;8:6-11.
12. Sur D, Sarkar BL, Manna B, Deen J, Datta S, Niyogi SK *et al*. Epidemiological, microbiological & electron microscopic study of a cholera outbreak in a Kolkata slum community. I*ndian J Med Res* 2006;123:31-6.
13. World Health Organization. Water Sanitation and Health (WSH): Water-related diseases, cholera. (http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/cholera/en/, accessed on 05 July 2011).
14. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Trends in aetiologies for diarrhoeal diseases. *Health Sci Bull* 2002;1:12-5.
15. Galal-Gorchev H, Ozolins G, Bonnefoy X. Revision of the WHO guidelines for drinking water quality. *Ann Ist Super Sanita*, 1993;29:335-45.
16. Gorchev H, Ozolins G. WHO guidelines for drinking-water quality. WHO Chron, 1984;38:104-8.
17. Malloy CD, Marr JS. Evolution of the Control of Communicable Diseases Manual: 1917 to 2000. *J Public Health Manag Pract* 2001;7:97-104.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০১০-আগস্ট ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৭৩)	*ভি. কলেরি ও১* (সংখ্যা=২৯৪)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৬৫.৮	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৬০.৩	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩০.৬	১.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪৯.৩	৯৮.৩
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৫৭.৮
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০.০
ফুরাজোলিডোন	৮৭.৭	পরীক্ষা করা হয় নি

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০১০-আগস্ট ২০১১

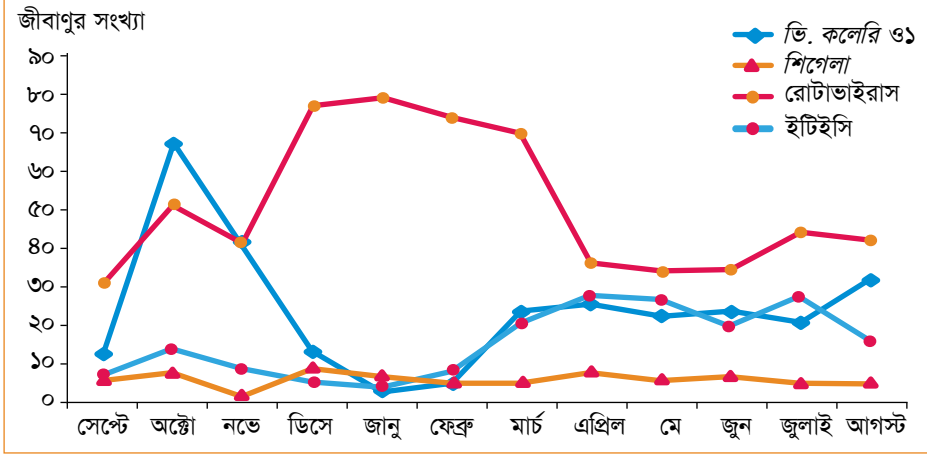

ওষুধের বিরুদ্ধে ১৪৫ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: আগস্ট ২০১০-জুলাই ২০১১

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট সংখ্যা=১৪৫ (%)
	প্রাথমিক সংখ্যা=১৩৩ (%)	একোয়ার্ড* সংখ্যা=১২ (%)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	২১ (১৫.৮)	৩ (২৫.০)	২৪ (১৬.৬)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৪ (৩.০)	১ (৮.৩)	৫ (৩.৪)
ইথামবিউটাল	১ (০.৮)	১ (৮.৩)	২ (১.৪)
রিফামপিসিন	৪ (৩.০)	১ (৮.৩)	৫ (৩.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	১ (০.৮)	১ (৮.৩)	২ (১.৪)
অন্যান্য ওষুধ	২৪ (১৮.০)	৩ (২৫.০)	২৭ (১৮.৬)

( ) শতকরা হার *একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২	২ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২	১ (৫০.০)	০ (০.০)	১ (৫০.০)
ক্লোরামফেনিকল	২	২ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিআক্সোন	২	২ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২	২ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	২	০ (০.০)	০ (০.০)	২ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	২	২ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৩	১৩ (৫৬.৫)	০ (০.০)	১০ (৪৩.৫)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৩	১৪ (৬০.৯)	০ (০.০)	৯ (৩৯.১)
ক্লোরামফেনিকল	২৩	১৪ (৬০.৯)	০ (০.০)	৯ (৩৯.১)
সেফট্রিয়াক্সোন	২৩	২৩ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৩	০ (০.০)	২৩ (১০০.০)	০ (০.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৩	১ (৪.৩)	০ (০.০)	২২ (৯৫.৭)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: জুলাই ২০০৮-আগস্ট ২০১১

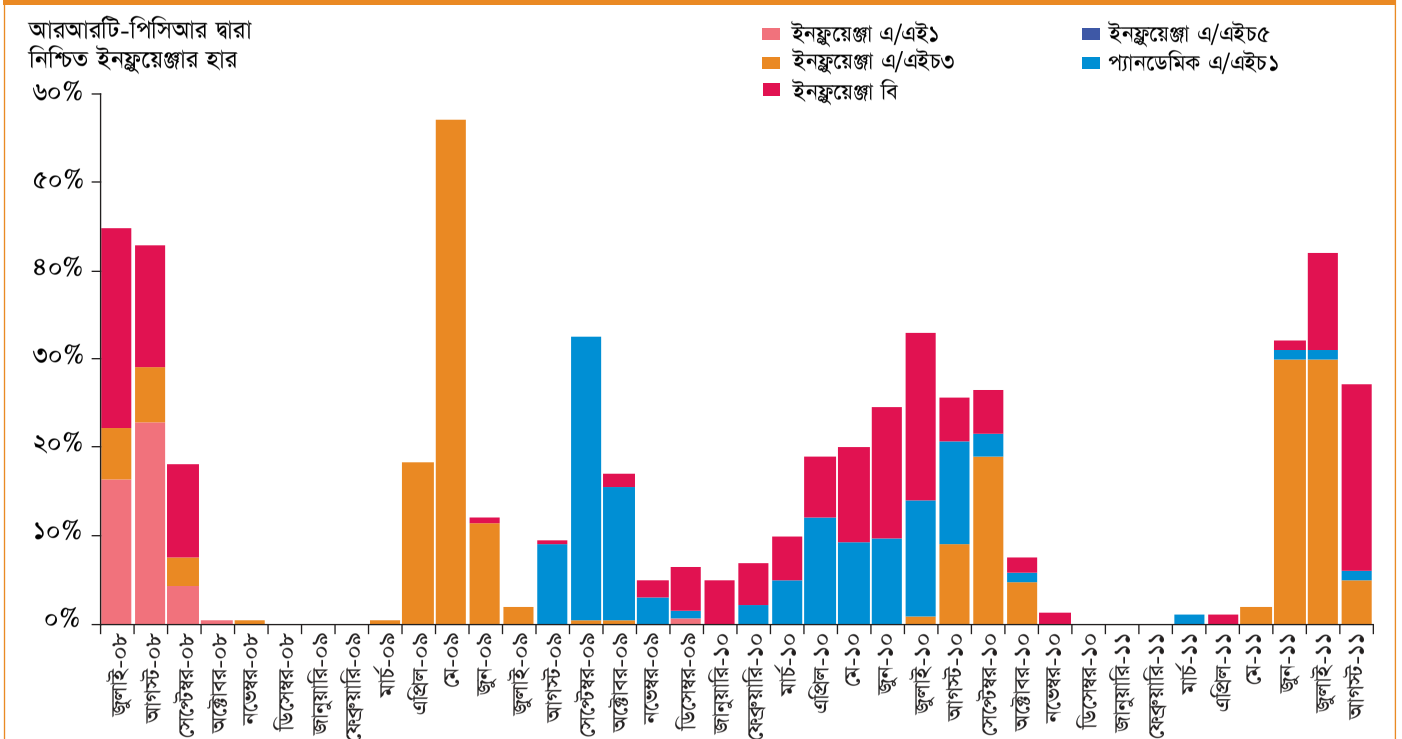

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

চিত্র ১: একজন মহিলা পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত ট্যাপের পানিতে মাছ ধুচ্ছেন। পানি যে পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তা একটি খোলা নর্দমার মাঝে ডুবে আছে (বামে), এবং একজন মহিলা চাপকলের অভ্যন্তরস্থ পানির উচ্চতা বাড়ানোর জন্য এর ভিতরে ট্যাপের পানি ঢালছেন (ডানে)

আইসিডিডিআ,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
এমিলি এস. গারলি
ডরথি সাউদার্ন

অতিথি সম্পাদক:
ক্রিস্টিনা আর সোলোয়েটস
রুখসানা গাজী

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
১ম নিবন্ধ:
আসাদুলগনি
২য় নিবন্ধ:
জহিরুল ইসলাম
৩য় নিবন্ধ:
ফারহানা হক

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে:
প্রিন্ট লিঙ্ক প্রিন্টারস

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb